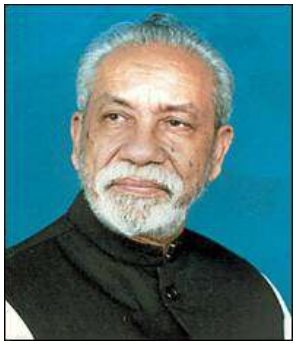

অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। দুই বন্ধুর গল্প ।।

১৯৬৪ সালের কথা। আমি তখন যশোর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের সাহিত্য প্রতিযোগিতায় কি একটা বিষয়ে যেন পুরস্কার পেয়েছিলাম একটি বই। নাম - জেলের কবিতা। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। জেলেদের কবিতা আবার কি? বাড়ীতে এসে যখন পুরস্কার পাওয়া সব বইগুলো তুলে দিলাম আম্মার হাতে - আম্মা সবগুলো বই ফেলে লেখকের নাম দেখে ওই বইটাই ছোঁ মেরে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। একটু পর আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন - জানিস এটা গাজী ভাইয়ের লেখা কবিতার বই। গাজীউল হক। আমার মামাতো ভাই। জেলে বসে এ কবিতা গুলো লিখেছেন (এতক্ষণে বুঝলাম কেন বইটির নাম জেলের কবিতা)। বললাম আম্মা কোনদিন তো এ মামাকে দেখিনি। আম্মা বললেন গাজী ভাইরা এখন বগুড়াতে থাকেন। শৈশবে নোয়াখালীতে ছিলেন। আমিই দেখিনি আজ কত বছর। তখন আম্মা, সেতারা খালারা ছিলেন গাজী মামার খেলার সাথী। আমাদের সেই সেতারা খালাও তখন যশোরে। খালু আব্দুল হাই তখন যশোর জেলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। আম্মা তখন বললেন ভাষা আন্দোলনের কথা। তাঁর গাজী ভাইয়ের বীরোচিত ভূমিকার কথা। পাশাপাশি এটাও বললেন তাঁর গাজী ভাই হাসি আনন্দে নাচে গানে ভরপুর এক মানুষ। ওদিকে ছোট বেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাঁর স্বভাব।

সেতারা খালা একদিন বাসায় আসতেই আম্মা জেলের কবিতা বইখানি তাঁকে দেখাতে গল্প উঠে গেলো গাজী মামার। সেদিনই প্লান। সবাই বগুড়া যাবে। সেই মোতাবেক আমরা দুই পরিবারের ডজন খানেক সদস্য চললাম বগুড়ায়। ট্রেনের ঝুকুর ঝুকুর শব্দের সাথে ছড়া মেলাচ্ছি - তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই। কল্পনায় আঁকার চেষ্টা করছি মামা মামীর মুখ। কেমন হবে গাজী মামার মুখ? খুব কি গুরু গম্ভীর? আম্মা বলেছেন গাজী মামা নাকি ব্যায়াম করেন নিয়মিত। কিন্তু আবার তো বলেছেন মামা গানও করেন। খুব আমুদে লোক। যাহোক দুরু দুরু বুকে যখন মামার বাড়ী পৌঁছলাম দেখি চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন গাজী মামা - কই আমার মামু কই মানিক (আমার আম্মা) কই সেতারা কই। দৌড়ে আমায় বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। কয়েক দিনেই মনে হলো আমার খেলার সাথী পেয়ে গেলাম। কখনো তাঁর বাগান দেখাচ্ছেন কখনো আবৃত্তি করছেন কখনো গান গাইছেন। তবলাটা সামনে এনে বললেন আমি

শুনেছি মামু তুমি তবলা বাজাও। আর আমাদের পায় কে? নাও বাজাও - 'অমর প্রাণ শহীদান গাহি তোমাদের জয়গান ----'। এমনই একখান মামা আমাদের। শিশুর সাথে শিশু। অসহায় মানুষের সহায়। শ্রোতার কাছে শিল্পী। মক্কেলের কাছে এ্যাডভোকেট সাহেব। মক্কেল পয়সা দিতে পারুক না পারুক ভ্রুক্ষেপ নেই। লড়তেই হবে। জিততেই হবে। কোর্ট হোক বায়ান্ন হোক উনসত্তুর হোক একাত্তর হোক। জিততে তাঁকে হবেই। জিতেছেনও। চাওয়া পাওয়ার হিসেব ছাড়াই জিতেছেন। জিতেছেন বাঙালির মন। যতদিন বাঙালির মুখে বাংলা ভাষা থাকবে গাজীউল হক ততদিন থাকবেন। তিনি তো যান নি। যেতে পারবেন নাতো।

সময় গড়িয়ে গেছে গাজী মামার সাথে পরে আর তেমন যোগাযোগ ছিলো না। তবে নিত্যদিন কাছে পেতাম তাঁর বোন আমাদের হীরা খালাম্মাকে। মঞ্জু আপাকে নিয়ে খালা খালু তখন ঝিনাইদহে থাকতেন। খালু ওয়াপদার প্রকৌশলী। হীরা খালাম্মা খুব ভালো গাইতেন। তেমনি নাচতেন মঞ্জু আপাও। সময় গড়াতে গড়াতে তখন ১৯৮২-তে এসে ঠেকেছে। সে বছরই বিয়ে করলাম কবিতাকে। এম আর আখতার মুকুলের বড় মেয়ে। দেখি আমার গাজী মামা এবং আমার শ্বশুর হরিহর আত্মার দুই বন্ধূ। একে অপরকে তুই করে কথা বলেন। একদিন মামা কবিতাকে বলেই ফেললেন - এইবার করবা কি? চাচা ডাকবা না মামা ডাকবা? আমি বললাম মামা ছোট বেলা থেকেই আপনি আমার মামা আর ওর চাচা। সম্পর্ক যাই হোক ডাকটা তেমনই থাক। সেই চেনা অট্টহাসি দিয়ে আমাদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে বুকে মাথা রাখলেই যেন শোনা যায় "ভুলবো না সেই রক্তমাখা একুশে ফেব্রুয়ারী"।

শ্বশুরালয়ে গেলে দেখতাম সকাল বেলার প্রথম টেলিফোন কলটা এম আর আখতার মুকুল গাজী মামাকে করতেন। ওপাশ থেকে মামী ফোন না ধরেই বলতেন - ওই যে তোমার দোস্ত স্মরণ করেছে। শুরু হবে তাঁর সকালের লেখা দিয়ে। পুরোটাই মামাকে শুনতে হবে। কোন কোন দিন লেখা নিয়েই টেলিফোনে শুরু হয়ে গেলো বিতর্ক। দুজনেই খুব জোরে কথা বলেন। যাঁরা তাঁদের দুজনের কথার ধরণের সাথে পরিচিত নন তাঁরা শুনলে ভাববেন নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে গেছে। এ টেলিফোন আলাপ এক দেড় ঘন্টার নিচে নয় এবং সেটা প্রতিদিনই। অবাক লাগতো এঁদের কথা ফুরোতো না কোনদিন। দেশ এবং রাজনীতি - এই তাঁদের আলাপের বিষয়বস্তু। এম আর আখতার মুকুল মারা যাবার সময় বাসায় এসে খুব কেঁদেছিলেন গাজীউল হক। কবিতার কাছ থেকে শুনেছিলাম মামা কাঁদতে কাঁদতে মামীকে বলছেন - শুনছো আর তোমাকে আমার দোস্তের ফোন ধরতে হবে না। আমার অভিমানী দোস্ত আর কাওকে কোনদিন ফোন করবে না।

দুজনেই বাল্যবন্ধু। রাজনীতির ধারায় কখনো সখনো ভিন্ন মতের পথের হলেও বন্ধুত্বতে কখনো ভিন্নতা আসেনি। বাল্যকাল বগুড়াতেই কেটেছে দুজনের আবার ঢাকায়ও একসাথে। সেই ছেচল্লিশে পাকিস্তান আন্দোলন। তারপর একুশের আন্দোলন এবং স্বাধীনতার আন্দেলনে। দুজনার কেউ ছাড়েনি কারো হাত। এক সাথেই ভাষা আন্দোলন করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছেন " বায়ান্ন সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেটা আমাদের কাছে খুব থমথমে মনে হয়েছিলো, এ রকম একটা বিপদ সংকেতের মত শোনানোর জন্য সরকারি গাড়ি থেকে ১৪৪ ধারা জারির বার্তা সর্বত্র জানান দেয়া হচ্ছিল। যখন শুনলাম যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হই। মনে হচ্ছিলো আমাদের আন্দোলন কারা যেন বানচাল করে দেয়ার চেষ্টা করছে। রাত ৯টা/১০টার সময় আমরা ৭/৮ জন বন্ধু মিলিত হই ফজলুল হক হলের পুকুরের পূর্ব পাড়ে। যতদুর মনে পড়ে সেখানে মোহম্মদ সুলতান, আবদুল মোমেন, জিলুর রহমান, কমরুদ্দীন শহুদ, গাজীউল হক, আনোয়ারুল হক খান, এম আর আখতার মুকুল উপস্থিত ছিলেন। আমি নিজেও ছিলাম। (গাজীউল হক আমার সমসাময়িক, আমাদের গাজীউল হক পৃ:১৭)। সেদিনের সে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হলো। এম আর আখতার মুকুলের প্রস্তাবে এবং কমরুদ্দীন শহুদের সমর্থনে গাজীউল হক সভায় সভাপতিত্ব করলেন। ঘোষণা দিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হলো। তারপরই টিয়ার গ্যাস গুলি। শহীদ হলেন সালাম বরকত রফিকউদ্দীন জব্বার।

একাত্তরে স্বাধীনতার যুদ্ধেও সেই দুই বন্ধু একসঙ্গে। এম আর আখতার মুকুলের ভাষায় - .. কোন রকমে রাতের খাওয়াটা শেষ করলাম। ছোট্ট বাড়িটার সানবাঁধানো বারান্দায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে রইলাম। মনে হলো আমার আশে পাশে অসংখ্য অশরীরি আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিঝুম রাতের ঘন অন্ধকারে পাশের পায়ে চলা পথ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলেই চমকে উঠেছি। এমন সময় একটা রিক্সায় এ্যাডভোকেট গাজীউল হক এসে হাজির হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পড়েছি। স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বললো তুই এসেছিস ভালোই হলো। আমরা বগুড়ার সিভিল এ্যাডমিনেষ্ট্রেশন চালাবার জন্য একজন লোক খুঁজছি। কাল সকালেই সার্কিট হাউসে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নে। আমি রয়েছি মুক্তি বাহিনীর চার্জে। ... আমি এক দৃষ্টে ওঁকে তাকিয়ে দেখলাম। পরনে খাকি পোশাক আর কোমরে রিভলবার। ছেচল্লিশ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আবার দুজনেই বায়ান্নো সালে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলাম। কি আশ্চর্য! একাত্তরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধকালীন বগুড়াতে দুজনের আবার দেখা হলো। এবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই (এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি পৃ: ৬২-৬৩)

সিডনি চলে এসেছি ১৯৯২ তে। ভাগ্যগুণে এখানেও দুই বন্ধুকে পেয়েছিলাম তবে একসঙ্গে নয়। এম আর আখতার মুকুল এসেছিলেন ১৯৯৬ তে আর গাজীউল হক এসেছিলেন দু'বার। প্রথমবার ১৯৯৭ তে দ্বিতীয়বার ২০০২-এ। দুজনেই এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের অতিথি হয়ে। প্রথমবার যখন গাজীউল হক এসেছিলেন সেবার বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা আয়োজন করেছিলাম কবিতার আসর। তাঁকে সম্ভাষন জানিয়েছিলাম স্বরচিত একটি কবিতা দিয়ে যার চারটি উলেখযোগ্য চরণ-

’এখানে আছেন ভাষার পুরোধা বীর গাজীউল হক
হৃদয়ে যাঁর একুশ ললাটে মুক্তিযুদ্ধের তিলক
স্বপ্নে তাঁর সোনার বাংলা বাঙালির বীর সন্তান
শোনাবো তোমায় বিজয় কবিতা মুক্তির জয়গান’।

অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

দুই বন্ধুর স্বভাবও অনেকটা এক রকমের। তাঁদের কেউই প্রবাসে এসে বেশীদিন থাকতে চাইতেন না। হপ্তা না যেতেই বলতেন হাঁপিয়ে উঠেছি। কবে দেশে যাবো? দেশ যে তাঁদের কাছে কি ছিলো তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। দুজনারই এক কথা - এ দেশটাকে ভালোবাসি বলেই তো বেঁচে আছি। তথাপি দেশটাকে যেমন দেখতে চেয়েছিলাম তেমনটা আজো দেখতে পাইনি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কবে দেখবো? বঙ্গবন্ধু বলতে অন্তপ্রাণ দুজনেই। এমন কোনদিন পাইনি যেদিন তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে একবারের জন্যেও স্মরণ করেননি।

দ্বিতীয়বার গাজীউল হক যখন স্বস্ত্রীক সিডনি এলেন তখন তাঁর দুই মেয়ে নতুনা আর সুমনিকা সিডনিতে এসে গেছে। ওদেরকে নিয়ে সে যে কি হৈ হুলোড়। মনে হচ্ছিলো ২০০২ এ আমি ১৯৬৪-র গাজী মামাকে খুঁজে পেয়েছি। সেই মামাটা শেষের দিকে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্মৃতিও লোপ পেতে থাকলো। দুই বন্ধুই জীবনের শেষ দিনগুলো খুব কষ্টে পার করে দিলেন। অথচ সারা জীবন এঁরা দেশের কষ্ট দেশের মানুষের কষ্টের কথাই ভেবে গেছেন। দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। দুই বন্ধুর চলে যাবার মধ্যেও কত মিল। দুজনেই চলে গেলেন জুনে। এম আর আখতার মুকুল ২০০৪ এর ২৬ জুন আর গাজীউল হক ২০০৯ এর ১৭ জুন। মনে হয় যেন লড়াকু দুই বন্ধু এক সাথেই চলে গেলেন নতুন কোন এক অজানা লড়াইয়ে।

করুনাময় দুই বন্ধুর আত্মার শান্তি দিন। তাঁদেরকে জান্নাতবাসি করুন।